বাংলা উপন্যাসের নায়কেরা

আকিমুন রহমান

বাংলা উপন্যাসের নায়কেরা

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

চন্দ্রকুমার দে [১৮৮৯-১৯৪৬]
মৈমনসিংহ-গীতিকা সংগ্রহকর্মে যিনি সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর জীবন ও প্রাণ

তাঁকে মনে পড়ে
কারণে-অকারণে খুব মনে আসে তাঁর কথা
চন্দ্রাবতীর সাথে জয়চন্দ্রের বিশ্বাসহননের পালার ভেতর দিয়ে
সহস্রতমবারের মতো যেতে যেতে, তাঁকে মনে পড়ে
মলুয়ার আত্মহননমুখী ক্রন্দনের মুখোমুখি হয়ে,
তাঁর কথা মনে আসে
তাঁর দারিদ্র্যক্লিন্ন অসহ জীবন,
ওই যে তাঁর বাগ্দেবীসাধনা
নিঠুরা এই চির-উদাসিনীর কাছে আদ্যোপান্ত সমর্পণের স্পর্ধা ও তেজ
তাঁর হঠাৎ হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাওয়া
কিংবা তাঁর আশা-শূন্য-জীবনের জন্য দীনেশচন্দ্র সেনের হাহাকার-বিলাপ
মুহুর্মুহু তাঁকে নিয়ে আসে, অন্তরের অতি সন্নিকটে
পেয়ে যাই তাঁকে, খুব পেয়ে যাই
তাঁকে মনে পড়ে।
এই যে কেবল ব্যর্থতাই সত্য হলো—অকৃতি-অকিঞ্চন এই নগণ্য লেখকেরও জন্য
সুঘন এই বেদনা ও বিফলতা সয়ে নিতে নিতে,
তাঁকে মনে আসে।
অহর্নিশ মনে আসে।

মুখবন্ধ

বাংলা উপন্যাসের নায়কেরা শীর্ষক এই বইটি, এতে যে-কটি প্রবন্ধ সংকলিত হতে যাচ্ছে, তার চারটি—'বিভূতি-সন্দর্শন : অপর আলোয়'; 'কতিপয় বহিরিস্থিত ও তাদের বিফল বেদনার রূপ'; 'বুদ্ধদেব বসু, তাঁর স্বপ্নঘোরগ্রস্ত নায়কেরা' এবং 'বাংলা উপন্যাসের কয়েকজন রুডিন'—বেরোয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটিতে। ওই দশকের প্রথম ভাগে এগুলো প্রকাশিত হয় মাসিক *মাটি* ও *মাসিক সাহিত্যপত্র* পত্রিকায়। আর 'শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ : কতটা মৌলিক, কতটা প্রভাবজাত' এবং 'ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর সাথে, ভিন্ন এক অভিযানে' প্রকাশিত হয় একবিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় দশকে; প্রথমটি বেরোয় অনলাইন কাগজ *সংবাদপ্রকাশ*-এ, ধারাবাহিকভাবে। অক্টোবর ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩ সময়পর্বে। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় *সিনেমা দর্শন* পত্রিকায়, এপ্রিল ২০২২-এ।

প্রবন্ধগুলোকে আমি এখন, বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোনো বিষয়ের ওপর আলোসম্পাতকরণের চেষ্টা বা অভিলাষ বা পরিশ্রম-নিষ্ঠার স্বাক্ষরবাহী কিছু রচনা বলেই যে শুধু গণ্য করতে পারছি, তা নয়। বরং এগুলোতে আমি, এই লেখকের অন্তর্জগতের বিষম গভীর এক অভীপ্সা বা বাসনার পরিচয়ই ছলকে উঠতে দেখছি।

প্রবন্ধগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সেই কোন ভুলে-যাওয়া এক স্বপ্ন-সাধের কথা; রক্তের ভেতরে, ঝনাৎকার দিয়ে উঠছে। মনে আসছে যে, একদা, সেই নব্বইয়ের দশকে, এই লেখক তখন কেবলই মনস্বিতার

দুনিয়ায়ই রয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে যেত। তখন তার বাঞ্ছা ছিল যে, গভীর ও ব্যাপক রকমে সে কেবল ব্যাখ্যা ও ভাষ্যই রচনা করে যাবে। সৃজন করে তুলবে তন্নতন্ন গবেষণা ও নবতর আলোকপাতের এক নবরীতি-নবধারা। তখন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য গড়ার কর্মে ব্যাপৃত থাকাটাকেই তার কাছে গণ্য হতো অতি চাঞ্চল্যকর এক রোমাঞ্চ-অভিযান বলে। ওই-ই করে চলছিল সে তখন।

তারপর একদিন ক্রমে সে কখন কীভাবে যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাছে নিবেদিত থাকার শপথ ও মায়া এবং টানকে খসিয়ে ফেলেছে, সে কথা আর তার স্মরণেও আসে না। তারপর সে শুধু গল্প-পরস্তাব-কথাকার। শুধু ওই-ই। তারপর আবার হয়তো হঠাৎই একদিন তার মনে আসে সেই প্রথম স্বপ্ন ও পণের কথা। মননশীলতার কাছে ফিরে আসার তাগাদা ও ঘন টানটাকে আবার হঠাৎই সে যেন পেয়ে ওঠে, অন্তর্গত রক্তের ভেতরে। সে আবার আসে মননশীল রচনার কাছে। নিজেকে সঁপে দেয় ভাষ্য গড়ার কর্মে। তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ ও প্রফেসর শঙ্কু বিষয়ক রচনা দুটি।

প্রিয় পাঠক, নায়কময় বাংলা উপন্যাস-বিশ্বের রূপ-শোভা-মহিমা ও তেজ ও নীরক্ততা ও নিস্তেজতার সঙ্গে সুঘনপরিচয় সম্পন্ন করে ওঠার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আকিমুন রহমান
১২ নভেম্বর ২০২৪

সূচি

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ : কতটা মৌলিক, কতটা প্রভাবজাত	১১
বিভূতি-সন্দর্শন : অপর আলোয়	৯৪
কতিপয় বহিরিস্থিত ও তাদের বিফল বেদনার রূপ	১২৩
বুদ্ধদেব বসু, তাঁর স্বপ্নঘোরগ্রস্ত নায়কেরা	১৫৩
ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর সাথে, ভিন্ন এক অভিযানে	১৬৮
বাংলা উপন্যাসের কয়েকজন রুডিন	১৯৮

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ
কতটা মৌলিক, কতটা প্রভাবজাত

‘প্রভাতজীবনে এ-নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল!’

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে, এমন দুই কিশোরের আবির্ভাব ঘটে; যারা দুরন্ত। তুলনারহিত দুরন্ত। তারা নিজেদের ওই দুর্দম্য, সুবিপুল ও পরোয়াহীন দুরন্তপনা দিয়ে শুধু পাঠককেই অভিভূত করে তোলে না, সাহিত্য-সমালোচকগণকেও প্রবলরকমে মোহিত করে নেয়। নিজেদের ওই বেপরোয়া কর্মাবলির অপার দৌরাত্ম্যগুণে তারা শুধু চিত্তমুগ্ধকর, বিস্ময়-জাগানিয়া আর অনন্যই হয়ে ওঠে না; সাহিত্য-দুনিয়ায় অমরত্বও লাভ করে।

তাদের চরাচরে, কখনো কখনো তাদের দুজনকেই, সুবোধ-শান্ত রূপেও বিরাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু ওই আপাত সুশান্ত-দশাটি মূলত শিগগিরই আরও বড় কোনো ঝঞ্ঝা-ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তোলার এক পূর্ব-অবস্থা হয়েই বিরাজমান থাকে। অচিরেই তারা তাদের আশপাশকে জ্ঞাত করিয়ে দেয় যে, নিজেদের ওই আপাত অক্রিয়-প্রশান্ততার মোড়কে তারা কোনো দুর্দমনীয় আর অশঙ্ক দামালপনাকে মুড়ে রেখেছিল। তাদের জীবনের দিন-কয়েকের থির অক্রিয়তা হচ্ছে অন্য নব কোনো কর্মে বা কোনো এক নব রোমাঞ্চময় দায়-পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ারই পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র। তারা যেন বা ঝঞ্ঝারই মনুষ্যমূর্তি; বা যেন

ক্ষিপ্র খরস্রোতেরই মানব-কাঠামো তারা দুইজন। তাদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে উঠতে, আমাদের মনে এই বোধ জেগে উঠতে থাকে যে; যেন তাদের মধ্য দিয়ে তাদের স্রষ্টা—মনুষ্যজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্বল্পায়ু যে কিশোরবেলাটি আছে—সেই কৈশোরকালকেই আমাদের সামনে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

তাদের আবির্ভাব কাল থেকেই, বাংলা সাহিত্য, তাদের দিয়ে বিস্ময়-চমকিত হয়ে ওঠে। সাধারণ পাঠকের মুগ্ধতা তারা যতটা পায়, তারও চেয়ে ঢের বেশি অনুরক্তি-মোড়ানো স্তব তারা পায় পণ্ডিতজনের কাছ থেকে। তারা গণ্য হতে থাকে আমাদের সাহিত্যের আদি মানবকিশোর বলে। তাদের যিনি সৃজন করেছেন, সেই কারুকার পেতে থাকেন অঢেল অভিবাদন ও স্তুতি। অপূর্ব ও অভিনব চরিত্র সৃজনকারী হিসেবে তিনি নন্দিত হতে থাকেন।

এই যে দুই কিশোর, তাদের নিয়ে গড়ে তোলা আখ্যানে, তারা একই সাথে দেখা দেয় না। তাদের আগমন ঘটে আগুপিছু হয়ে হয়ে। আবার তাদের পরস্পরের চেনাশোনা এবং ভাব-পরিচয়টাও কিছুমাত্র সুস্থিতরকমে ঘটে ওঠে না। তাদের দুজনের দেখা হয় অতি উৎকট এক সংকটময় পরিস্থিতিতে। তখন তারা দুজনই আছে এক উটকো বিপত্তির ঘেরে, আছে বেশ বিপন্ন অবস্থায়। একজন তখন কেবল নিরুপায় দেহে, আক্রমণকারীদের আঘাতগুলো সহ্য করে চলছিল। অন্যজন ছিল তার বিপরীত অবস্থায়। সে তখন তার কৌশল-ক্ষিপ্র হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণই প্রতিহত করে চলছিল না; একই সাথে নিজেও অবতীর্ণ হয়ে উঠেছিল পাল্টা এক আক্রমণকারীর ভূমিকায়।

তারপর সে শুধু আত্মরক্ষার জন্যই সচেষ্ট থাকে না; তার একেবারেই অচেনা আর বিপন্ন, অশক্ত সঙ্গীটিকে রক্ষার জন্যও তেরিয়া এক লড়াকু ভূমিকাও পালন করতে থাকে সে। দুজন তখন একে অন্যের সহায় হয়ে ওঠে, একসঙ্গে তারা উপস্থিত বিপত্তির মোকাবেলা করে।

আমরা দেখতে পাই, এই যে প্রায় সমবয়সি দুই কিশোর—তাদের একজন হচ্ছে সংকট-জটিলতার কালে প্রবল সক্রিয়; আর অন্যজন

বিপদের মোকাবেলা করতে একেবারেই অপারঙ্গম। রূঢ় বাস্তবতার ঝাপটা তাকে হতবিহ্বল করে তোলে। বিপত্তির মুখোমুখি হয়ে সে ভড়কে যায়, নিষ্ক্রিয় থেকে আরও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, আরও আক্রান্ত হতে থাকে। এই দুই বিপরীত-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুই কিশোরকেও কি তাদের স্রষ্টা, শুধুই দুটি ভিন্ন চরিত্র গড়ে তোলার প্রয়োজনেই সৃজন করেছেন? নাকি, তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন অন্য এক ভিন্ন আবেগে? সতেজ সক্রিয়তা আর ভীতিকুণ্ঠ-নিষ্ক্রিয়তা মনুষ্য—কিশোরের কৈশোরকালেরই দুই ভিন্ন রূপ। কিশোরকালের ওই দুই-রূপই যেন এই দুই কিশোরের মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে এইখানে, তাদের জন্য গড়ে তোলা এই আখ্যানে।

তবে সমুদ্যত দুর্বিপাকের সময়ে তাদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে ঠিক, কিন্তু ওই প্রথম সাক্ষাৎকালেই তাদের মৈত্রী ঘনীভূত হয় না। বরং একজনের প্রকাশ্য ডাকাবুকোপনা ও বেয়াড়া চলনবলন দেখে অন্যজনের শরীর ও মন অতি সংকোচে ও গাঢ় কুণ্ঠায় জড়োমড়ো হয়ে যেতে থাকে। তখন ওই দস্যিজনের জন্য অপরজনের চিত্তে যেমন বিমুখতা জাগে, তেমনই আবার ঘন বিস্ময়ও জেগে ওঠে। কিন্তু দূরত্ব রয়ে যায়। থাকে অনেক দূরত্ব। তাদের মিত্রতা গড়ে ওঠে পরে। ক্রমে কদমে কদমে একসাথে চলতে চলতে ওটা গড়ে ওঠে।

বাহ্যত তাদের স্বভাবে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। একজন বিদ্যুৎক্ষিপ্র। দুনিয়াকে সে বোঝেশোনে ভালো, বোঝে তার নিজের বুঝ অনুসারে। এবং সে আপনা থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে, এই জগৎ-সংসারকে পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। একে পরোয়া করার কোনো কারণ নেই। জীবনের পথে পথে চলতে হবে নিজের ইচ্ছে-খুশিমতো। ওই-ই করতে হবে। আর অন্য কিছু নয়। সে তার কিশোরবেলায়ই এমন মীমাংসায় অনড় হয়ে ওঠে। এবং সে চলতে থাকে নিজ অন্তরের তাগাদা-মাফিক। তার প্রকাশ্য সকল আচরণেই সে পরোয়াশূন্য। সে গ্রাহ্য করে না কোনো কিছুকেই। চরাচরের অন্য দশজনের চক্ষে নিজেকে সুবোধ প্রতিপন্ন করার কোনো তাগাদা নেই তার। তার

অন্তরাত্মা যা করতে চায়, চালু বিধিবিধানগুলো যেভাবে দলে চলতে চায়, সে সেটা করে। করে অকুণ্ঠপ্রাণে। সামাজিক নিন্দা আর অখ্যাতির শঙ্কা কদাপি স্পর্শ করে না তাকে। কণ্টক তাকে বিদ্ধ করার জন্য শানিয়ে থাকে, সে বিদ্ধও হয়; কিন্তু সেসবের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না সে।

এইজন বিজুলিপাতের মতো ঝিলিক দিয়ে, হঠাৎই, হাজির হয় আমাদের সমক্ষে। চোখ তো ধাঁধায়ই, চিত্তও চঞ্চল করে, প্রবলভাবেই করে। সে গৃহে-সংসারেই বাস করে, তবে সেটা নিতান্তই যেন, থাকতে হয় বলেই থাকা। যেন গৃহত্যাগের সঠিক লগ্নটির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাকে; অপেক্ষমাণতার সময়টুকুতে সে আছে, সংসারে অন্যদের সাথে। দিন পার করে চলছে শুধু। অন্তরে সে কতটা দরদি কতটা মায়াকাতর, তার সন্ধান জানে শুধু গুটিকয় লোক, যারা তার নিবিড় নিকট হওয়ার ভাগ্য পায়!

বাইরে সে সদা নিস্পৃহ। লোকচক্ষে তার চলাচলতি গণ্য হতে থাকে হঠকারিতা আর চরম খামখেয়ালীতে ভরা এক সর্বনাশা ক্রিয়াকাণ্ড বলে। তবে ভেতরে ভেতরে সে বিপন্নের ত্রাতা। যে-কোনো বিপদাপন্নের সহায় হওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত সে। বরাবরই সে আর্ত-দুঃখীজনের বান্ধবের অধিক বান্ধব হয়ে পাশে থাকে। তাদের যে-কোনো সংকটের কালে সে একাই সংকট সামলে নিতে এগোয়। কুণ্ঠিত বোধ করে না। বরাবরই নির্ভীক তার প্রাণ। বয়স্করাও যেই পরিস্থিতিতে ভয়ে মিনমিন, সেখানে কিশোর এইজন—ভাবনা ও ভয়মুক্ত হয়ে এগোতে থাকে। অভয় জাগায়, রক্ষা করে। অগ্রগামী সে, সকল বিপন্নতা মোচনের কাজে।

ঝঞ্ঝা ও নদীস্রোতের মতো এক পরোয়াশূন্য অকুণ্ঠতা ও তেজকে ধারণ করে সে, তার অন্তরে এবং বাহিরে। সর্ব সংসারী লোকের চক্ষে সে 'লক্ষ্মীছাড়া, নষ্ট-দুষ্ট, সর্বনেশে, বখে-যাওয়া' একজন; যার সান্নিধ্য থেকে নিজ নিজ পুত্রদের তফাতে রাখার জন্য সকলে মরিয়া। সুশীল সামাজিকগণ উদ্বিগ্ন থাকে সকল সময়, পাছে তার প্রভাবে অন্য

গৃহস্থবালকগণ তার মতোই বিগড়ে যায়। সামাজিক নিয়ম-বিধি মান্য করে চলার পথ ত্যাগ করে, তারা না আবার হয়ে ওঠে বিপথগামী। তা হলে সংসারে বিপত্তির আর অন্ত থাকবে না! এই যে অন্যপথ-উতলা, বুনো আর নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য উদগ্র কিশোর; তাকে আমরা ইন্দ্রনাথ নামেই চিনতে থাকি।

তার সহচর অন্য যে-জন, তার এই কিশোর-কালেই যেন সে হয়ে উঠেছে, কেবলই এক দর্শক। সমাজ-সংসারকে কেবলই নির্লিপ্ত-চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে যেতে থাকা এক দর্শক। সে আছে সমস্ত কিছুতেই। বড়োদের ফরমাশমাফিক চলনে আছে, বিধিরীতি মতো কর্মসম্পাদনে আছে; বিদ্যাপীঠের পড়া মুখস্থকরণে আছে, পড়া ফাঁকি দেওয়ায়ও আছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার কোনো লগ্নতা নেই। সবকিছুতেই সে আছে সন্তর্পণ আলগোছে।

এইজন বাহ্যিকভাবে নিতান্ত শান্ত, সংসারের নিয়ম-নির্দেশ মান্য করায় তার যেন কোনো আপত্তি নেই, বরং ওটি করে যেতে থাকে সে বিকারশূন্য মনে ও শরীরে। উচ্চকণ্ঠ বাদ-বিসংবাদে নেই সে। মুরুব্বি-পরিজন ও বিবিধ বিধির মধ্যে, সে, সুগাঢ় মৌনতা নিয়ে বাস করে চলে। তার অন্তরের ওঠাপড়া বা অস্থিরতার কোনো সংবাদ কেউ জানে না। বা, তার ভেতরে, তারই অন্য আরেক সত্তারও বসত আছে; যেই সত্তা তীব্র জেদি ও উচ্চণ্ড রাগী; এমনটা তার পরিজনদের কেউ ভাবতেও পারে না। স্বজন-সমক্ষে সর্বদাই একান্ত নিস্তেজ-নিরীহ একজন সে।

নিতান্ত সাদাসিধে চলন-বলন তার। সে কাউকেই তার অন্তরের পরিচয় জানতে দিতে কিছুমাত্র আগ্রহী নয়। তার নিজের ভেতরের বিলোড়ন ও দৃপ্ত তেজকে ঢেকে রাখতে সে খুবই পারঙ্গম, সদা সে থাকে চুপমুখে। যেন থাকে ছায়ার মতো। ধীর ছায়া। সুবোধ নম্র ছায়া। কিন্তু ভেতরে-গহিনে সে ইন্দ্রনাথের মতোই বিধি-ছিন্নভিন্ন করে তোলার জন্য প্রস্তুত। অন্তরে অন্তরে সেও ইন্দ্রনাথের মতোই খর বিজুলি এক। যদিও তার বাহ্যিক সত্তা, তার অন্তরের সেই বিদ্যুতের কণা-কিঞ্চিৎ

ঝলককেও, প্রকাশ করে না। সেও পথে নেমে, পথ হারিয়ে ফেলার তাগাদাকে বোধ করে তার সর্বসত্তায়। কিন্তু ওই কিশোরকালে, সেই তাগাদাকে প্রকাশ করে ওঠার, সামর্থ্য যেন সে পায় না। আমরা জেনে উঠি যে, এই তার নাম শ্রীকান্ত।

এই যে দুই কিশোর—শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ, বাংলা উপন্যাসে তাদের আগমন ঘটে *শ্রীকান্ত* প্রথম পর্ব (১৯১৭) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাদের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। শরৎচন্দ্র দেখান যে, বাহ্যিকভাবে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তাঁর এই দুরন্ত দুই বালক—তাদের এই কিশোর বয়সে, সমাজ-সংসারবাসী বটে; সামাজিক রীতিবিধি মান্যকারী সুমতি-সম্পন্নদের সঙ্গেই বসবাস তাদের; কিন্তু তারা শিষ্ট সুশীল হওয়ার বোধ ও তাগাদাহীন। তারা চলতে চায় নিজ অন্তরের সাব্যস্ত করে দেওয়া নিয়ম ধরে। সমাজে সংসারে তাই তারা বাস করে খাপছাড়া, বহিরিস্থিত হয়ে। তারা চালিত হয় নিজ প্রাণের বাসনা, বিবেচনা ও বাঞ্ছা দিয়ে। যেই বাঞ্ছা ও বিবেচনাকে স্থির-মন্থর, নড়ন-অনীহ সমাজ ও সামাজিকেরা চিরকাল ধরে গণ্য করে আসছে মন্দমতি বালকের দুর্বুদ্ধি বলে।

আমাদের এই বালকদ্বয় প্রবলরকমেই দুর্বুদ্ধিচালিত। তারা দুইজন তাদের আশপাশের—অচলতামোড়ানো, শম্বুক-মন্থর আর পরিতোষে নিদ্রালু সংসারে আর সমাজে—নিয়ে আসতে থাকে অস্থির সচলতা। আর আনতে থাকে, অতি সমাজ-গর্হিত কর্মকাণ্ডের দমক-ঝমক। যেই দমক-ঝমকের ঝাপটার দাপটে, নিয়মমোড়ানো শিথিল জীবন; ত্রস্ত আর বেদিশা আর উথাল-পাথাল হতে থাকে।

আখ্যানের প্রকাশকাল থেকেই মনে করা হতে থাকে, এমন অভিনব দুরন্ত কিশোর নায়কের দেখা, বাংলা সাহিত্য, এর আগে অমন তীব্রভাবে আর কখনো পায়নি। পণ্ডিতজনেরা তাদের দুজনের অভিনবত্ব ও দৌর্দণ্ডপ্রতাপশালিতার মহিমা রচনায় হয়ে ওঠেন অক্লান্ত ও মুখর। তাঁরা জানাতে থাকেন, ওই দুইজন শুধু অভিনবই নয়; তারা আমাদের সাহিত্যে প্রবলরকম মৌলিক সৃষ্টি এবং তারাই আদিকিশোর। তাদের